দিয়ে বুখারা, পারস্য দেশ ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে পৌঁছবার পথ এই গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে। এই পথ ধরে বণিকেরা নিয়মিত পণ্য আদান-প্রদান করত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রীকদের মতো চীনা ভৌগোলিকদের লেখাতেও **দুটি সুস্পষ্ট** ধারা লক্ষ্য করা যায় : **সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং গাণিতিক ঐতিহ্য** ঐশ্বরিক সৃষ্টিবাদের ওপরে নির্ভর না করে চীনা দার্শনিকেরা **যান্ত্রিক-ভাবে পার্থিব রহস্যগুলির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন,** গ্রীক ও চীনা পণ্ডিতদের ভূগোলচর্চার এটিই সবচেয়ে বড় পার্থক্য।

মিল ও পার্থক্য

2.2.5 ভারতে ভূগোলের আদিযুগ (Ancient Geography in India)

ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টিকাল থেকে ভৌগোলিক ধ্যানধারণাগুলি গড়ে উঠেছে। হিন্দু দর্শন, মহাকাব্য, ইতিহাস ও পুরাণগুলির মধ্যে ভৌগোলিক তথ্য ও ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রম অনুসারে **বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থাবলী, এবং পুরাণসমূহ হল** আদিকালের ভারতীয় ভূগোলচিন্তার উৎস। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় ভূগোলের উৎপত্তির যুগে **ধর্ম** একটি **প্রধান ভূমিকা** পালন করেছে।

এর থেকে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে মানুষের উন্নতির সাধারণ পথ থেকে আলাদাভাবে অদ্বিতীয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। কিন্তু সবাই একথা মানেন না। তাঁদের মতে ব্যাপারটা এর ঠিক বিপরীত। প্রাচীন ভারত ও চীনদেশে মননের (বা পুরাবিজ্ঞানের—*protoscience*) যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল গ্রীসদেশের মতো উন্নত না হলেও তা কালে কালে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা ছিল। পাশ্চাত্যের পুষ্টি ও সংস্কৃতি এদের গ্রাস করে ফেলার জন্য মধ্যপথে এই উন্নতির ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রধান দুর্বলতা আছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রকৃতি কি? পশ্চিমের সভ্যতার বিশেষ গুণটিই বা কি? কি তার ছিল যে সমগ্র পৃথিবীতে সে প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হল, আর ভারত এবং চীনদেশ পড়ে রইল বহু পিছনে?

ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়েই পাশ্চাত্য দেশগুলি সভ্যতার মাপকাঠিতে পিছিয়ে ছিল। খ্রিস্টধর্মের তীব্র মনন-বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক যুক্তিচিন্তার সমস্ত চিহ্ন ইউরোপ থেকে মুছে ফেলেছিল প্রায় এক হাজার বছরের জন্য। এসময়ে গ্রীক চিন্তাধারার আলো বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আরবদেশের মুসলিম ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা। শুধু তাই নয়, ইউরোপের শক্তির উৎসগুলি, যেমন চাকা-লাগানো চৌপাগাড়ি বা বারুদ প্রভৃতি উদ্ভাবনের বেশির ভাগই এসেছে চীন দেশ থেকে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় এক হাজার বছর ইউরোপ ছিল প্রাচ্যের সভ্যতাগুলির চেয়ে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাযুক্তিকভাবে নিকৃষ্ট। চীন ও ভারতের সভ্যতাগুলির প্রতি পাশ্চাত্যের ঋণ অপরিমেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রায় প্রতিটি ভাব (*idea*) ও উদ্ভাবন প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে ধার করা।

তবু প্রশ্ন ওঠে, ভারত ও চীন কি সত্যিই বিজ্ঞানের পথে হেঁটেছিল? এই দুই দেশের একটিও কি বিজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক এমন কোনও জ্ঞানের তত্ত্ব গড়ে তুলেছিল? পণ্ডিতই এর উত্তর **নেতিবাচক**, কারণ তিন-চার হাজার বছরের সার্থক জ্ঞানসাধনার পরেও প্রকৃতপক্ষে 'বিজ্ঞান' বলতে যা বোঝায় তা গড়ে তুলতে পারেনি তারা। প্রাচীন ভারতীয় ও চীনা পণ্ডিতদের গড়ে তোলা বিশদ তত্ত্বগুলির বেশির ভাগই **অনুমানভিত্তিক, এবং নিরপেক্ষভাবে তাদের যাচাই করা কঠিন।**

সুপ্রাচীন ও রহস্যময় ভারত

কমপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার সাল থেকে প্রাচীন ভারতে জ্ঞানচর্চার শুরু। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

হিন্দুধর্মের **দূরকল্পী চিন্তাধারায়** (speculative thinking) পরমেশ্বরে আত্মা বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। পরমাত্মায় একীভূত হয়ে যেতে পারলে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও পরম ক্ষমতা অর্জন করা যাবে। **ক্রোমারের** (Cromer, 1993) মতে এ হল **অহংকেন্দ্রিকতার** (egocentrism) চূড়ান্ত রূপ। ফলশ্রুতি হিন্দু চিন্তাধারা এই অহংকেন্দ্রিকতা থেকে কখনই

বেরিয়ে আসেনি, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব জগতের গুরুত্ব কমে আসার প্রবণতা বেড়েছে। উচ্চস্তরের দার্শনিক চিন্তায় পার্থিব জগতকে পরিত্যাগ করে অরণ্যে আশ্রমজীবন কাটানোর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া হিন্দু সমাজের **বর্ণাশ্রম প্রথা**—সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধার নিয়মও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক ছিল না। এর ফলে ভারতে সর্বোচ্চ স্তরের পণ্ডিতরা গড়ে উঠলেও তা একচেটিয়াভাবে **সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত হয়ে রইল।** বর্ণাশ্রম প্রথার কড়াকড়ির ফলে এই জ্ঞান **সমাজের সর্বস্তরে বিকীর্ণ হতে পারল না।** বর্ণাশ্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা মানুষের প্রশ্ন করার উপায় ছিল না।

এছাড়া হিন্দু চিন্তাধারার এক **নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি** প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। পার্থিব জগতের প্রতি প্রাচীন ভারতে ছিল এক পক্ষপাতহীনতা, কিংবা এক গভীর বিতৃষ্ণা। প্রাচীন হিন্দু চিন্তায় **জ্ঞান হল অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, অপার্থিব।** একজন বণিক বা হস্তশিল্পীর যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তার সঙ্গে উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার সাক্ষাৎ ও মিলন কমই ঘটেছে। আর বর্ণাশ্রম প্রথার কড়াকড়ির ফলে ব্রাহ্মণকে এই ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। তার ফলে **বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা** (scientific objectivity) পড়ে ওঠার সুযোগ মেলেনি, যদিও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র বহুদূরে এগিয়ে গেছিল প্রাচীন যুগে।

বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতীয় অবদান নিয়ে নানা ধরনের দাবি রাখা হয়। এক দিকে বলা হয় সমস্ত বিজ্ঞান, সভ্য মানুষের সমস্ত চিন্তা, হিন্দু পুরাণগুলিতে বিধৃত রয়েছে। এই দাবি মেনে নেওয়া কঠিন। অন্য দিকে বলা হয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় পুঁথিগুলি থেকেই আরব বিজ্ঞানের প্রস্ফুটন ঘটেছিল। এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বরং সহজবোধ্য এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য। 327 খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার সিন্ধু নদের পশ্চিমভাগ পর্যন্ত গ্রীক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। এই ভূখণ্ড পুনরাধিকার করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, এবং তাঁর পরে সম্রাট অশোক (খ্রিস্টপূর্ব 272–235) প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এসময়ে ভারতের সঙ্গে পারস্য, মিশর ও গ্রীস দেশের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে প্রায় 100 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে গ্রীক প্রভাব ছিল।

গ্রীসের সঙ্গে এই সম্পর্ক প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তারে খুবই সাহায্য করেছিল এতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় দর্শন ও গ্রীক চিন্তাধারার মিলন ঘটছিল। একথা সম্ভব হতে পারে যে ভারতীয় তত্ত্বগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগে গ্রীক পণ্ডিতেরা উৎসুক হয়ে উঠলেন। কারণ গ্রীসদেশে এরকম সময়ে **হিপারকাস** (Hipparchus) গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও ত্রিকোণমিতি বিষয়ক চিন্তাভাবনা করছেন।

সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম না হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে **যোগসূত্র** হিসাবে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে না পারার কারণ প্রধানত দুটি : ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানকে ধর্মের পবিত্রতায় স্পর্শ

বৈদিক গ্রন্থাবলী দ্বারা পরীক্ষিত **ভূখণ্ডগুলি** থেকেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রতিবেশী ভূমিখণ্ডগুলির সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্বন্ধ এগুলি থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চীন, মেসোপটেমিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশে পণ্ডিতেরা যে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করতেন, ভারতে তা অজানা ছিল না।

ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থগুলিতে মহাদেশগুলি এক একটি 'দ্বীপ' নামে পরিচিত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এসকল ভূমিখণ্ডের পর্বতমালা, নদনদীসমূহ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। **বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ভট্টিল, উৎপল, বিজয়নন্দী** এবং অন্যান্যরা জ্যোতির্বিদ্যা, গাণিতিক ভূগোল এবং মানচিত্র অঙ্কনে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

'ভূগোল' শব্দটি ভারতে প্রথম ব্যবহার করেন **সূর্যসিদ্ধান্ত**। প্রাচীন পুরাণে ভূগোলকে **খগোল** (মহাকাশবিজ্ঞান) এবং **জ্যোতিষশাস্ত্র** থেকে আলাদাভাবে বিচার করা হয়েছিল। বিশ্বজগৎ ও তার সৃষ্টি নিয়ে **বেদ ও পুরাণে** ভারতীয় পণ্ডিতেরা নানা চিন্তাভাবনার প্রমাণ রেখেছেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে পৃথিবীকে **'ব্রহ্মাণ্ড'** হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পৃথিবী, এরকম অনুমান করা হত। **পুরাণে নয়টি গ্রহকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ঃ** সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। ভারতীয় পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে গোলাকৃতি বলেই মনে করতেন, এবং সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ বিষয়েও তাঁরা অবহিত ছিলেন। পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি বিষয়ে তাঁদের গণনাও প্রায় সঠিক ছিল। **অক্ষাংশ ও দেশান্তর** (দ্রাঘিমারেখা)-এর ব্যবহারও তাঁদের প্রায় নির্ভুল ছিল। লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা)-র অবস্থান তাঁরা দেখিয়েছেন নিরক্ষরেখার ওপরে এবং **উত্তর মেরুতে মেরুপর্বতের** অবস্থান নির্ণয় করেছেন। উত্তর মেরুর উল্টোদিকে **দক্ষিণ মেরুকে বাড়বানল** নামে চিহ্নিত করেন প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা।

ঋক্‌বেদের মুনিঋষিরা **চারিটি দিক** নির্ণয় করে তাদের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ নামে চিহ্নিত করেন। এছাড়া দক্ষিণপূর্বকে আগ্নেয়, দক্ষিণপশ্চিমকে নৈর্ঋত, উত্তরপশ্চিমকে বায়ব্য, এবং উত্তরপূর্বকে ঈশান রূপে নির্ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে উর্ধ্ব ও অধঃ, অর্থাৎ উপর ও নীচ, দিক দুটিও যুক্ত করে দশটি রূপে নির্দেশ করেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা।

দিক্‌নির্ণয় ছাড়াও **স্থানীয় সময়ের পার্থক্য** নির্ভুলভাবে গণনা করার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পুরাণে **ভূকম্প** এবং **জ্বালামুখী** শব্দদুটির ব্যবহার আছে। এছাড়া কঠিন শিলা, কর্দমাক্ত ভূমি এবং বালুকাময় অশ্ম প্রভৃতির তারতম্যও প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে **বায়বীয় অবস্থা থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি** হয়েছে। তাঁরা মনে করতেন পৃথিবীকে ঘিরে আছে **অন্তরীক্ষ**; ভাস্করাচার্যের মতে এর গভীরতা দ্বাদশ যোজন (অর্থাৎ 154 কিলোমিটার)। বায়ু দিয়ে গঠিত এই অন্তরীক্ষে বায়ুপ্রবাহ, মেঘ, বজ্রপাত, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি বিষয় ঘটে। **ঋক্‌বেদে পাঁচটি ঋতুর** উল্লেখ আছে; অবশ্য বাল্মীকির রামায়ণে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বা শিশির, এবং বসন্ত এই **ছয়টি ঋতুর** নাম আছে।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানে দিগ্‌নির্ণয় পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে **সাতটি দ্বীপের** (বা ভূখণ্ডের) উল্লেখ আছে ঃ জম্বু, কুশ, প্লাসকা, পুষ্কর, শাল্মল, ক্রৌঞ্চ এবং শক দ্বীপ। এগুলির মধ্যে জম্বু দ্বীপ রয়েছে কেন্দ্রস্থলে, তাকে ঘিরে বাকি ভূখণ্ডগুলি রয়েছে। ভারতবর্ষ বা ভারত উপমহাদেশ জম্বু দ্বীপেরই অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের ভূগোল সম্পর্কেও প্রাচীন জ্ঞান যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই **চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল এখানকার জনগোষ্ঠী**। প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কর্ম ও সামাজিক স্থান। সেই অনুযায়ী প্রাচীন জনপদগুলিতে **গোষ্ঠীগুলির** বাসস্থানও নির্দিষ্ট হত। ভারতবর্ষের **পর্বত ও নদনদীগুলির** অবস্থান, উৎপত্তি ও গতিপথ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল। এমনকি হিমালয়ের বিভিন্ন অংশকে **অন্তরগিরি** ও **বাহিরগিরি** বলে মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বঘাট পর্বতকে **মহেন্দ্রগিরি** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা ছাড়াও লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), সিন্ধু, নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি নদীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে।

2.2.6 বিজ্ঞান ও ভূগোল ঃ প্রাচীন ভারত, চীন ও ইউরোপ— প্রাথমিক উন্নতি সত্ত্বেও ভারত ও চীন কেন পিছিয়ে পড়ল?

বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দু'টি বিষয়ে সকলেই একমত হন। **প্রথমত**, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে কোপারনিকাস, গ্যালিলেও, ও নিউটনের গবেষণাগুলির মধ্য দিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননের সূচনা হয়। **দ্বিতীয়ত**, ইউরোপের এই ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রীক গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকদের চিন্তাধারার জের হিসেবে।